ডিরোজিও ও ইয়ংবঙ্গেল ঃ ফিরে দেখা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ও ভারত সম্বন্ধে আগ্রহী বুদ্ধিজীবী ম্যাক্স মুলার উনিশ শতকের তিরিশের দশকের বাংলার কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ "সে যুগের বাংলার তণদের মনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ডিরে াজিও। পাদ্রিরা তাঁকে ধিক্কার দিতেন ধর্মদ্রোহী বলে। তাঁরা বলতেন যে টম পেইন নামে আর এক ধর্মদ্রোহীর চেলা এই শয়তানটি। কিন্তু ডিরোজিওর ছাত্ররা তাঁকে ভালবাসা, স্নেহ ও শুভবুদ্ধির প্রতিমূর্তি বলেই মনে করতেন।" ডিরোজিও মৃত্যুর তিন দিন পরে ১৮৩১ এর ২৯ ডিসেম্বর দি গভর্নমেন্ট গেজেট অকালে প্রয়াত এই তণ কবি, শিক্ষক ও একদল ভ ারতীয় যুবকের পথ প্রদর্শকরূপে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন যে " চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে" তেমনি ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আকৃষ্ট করতেন। শিবনাথ লিখছেন ঃ "স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া ছাত্রদের পাঠে সাহায্য করিতেন। তাঁহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপর পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন। স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হইতে লাগিল।" শিবনাথ আরও লিখেছেন যে ডিরোজিও মাত্র পাঁচবছর হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি " তাঁহার শিষ্যদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া ছিলেন যাহা তাঁহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল।"

এক শতাব্দী পরে, প্রসিদ্ধ মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ও খ্যাতিমান শিক্ষক অধ্যাপক সুশোভন সরকার ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গ ল সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ" এই আন্দোলনের সবচেয়ে স্মরণীয় দান হচ্ছে নির্ভীক জাতীয়তাবাদ এবং নবাগত পশ্চিমী ভাবধার ার পুনর্জ্জীবনে অকপট স্বাগত সম্ভাষণ। শতাব্দীর শেষাশেষি এর অনেক কিছুই ঐতিহ্যবাদ, আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ, ধর্মান্ধত াবাদ ইত্যাদির স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। সেই পরিবর্তন আমাদের জাতীয় জীবনে কোনও মঙ্গল এনেছে কিনা এ সন্দেহ পে াষণ করা অন্যায় হবে না।" আরও সম্প্রতি, এই শতাব্দীর আশির দশকে আধুনিক গবেষক অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত আর এক পা বাড়িয়ে ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গলকে এদেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথিকৃৎ বলেছেন। আবার একথাও মনে রাখা দরকার যে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল গবেষকরা ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গকে " Intellectual Alien " বলে চিহ্নিত করেছেন, বলেছেন যে তাঁরা এক প্রজন্ম যাঁরা হচ্ছেন " A generation without parents and without any children."

ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গল সম্বন্ধে এখন, আমরা যখন একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে, আমাদের সামগ্রিক মূল্যায়ন কি হ'বে ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গল সে যুগে বাস্তবে কি করেছিলেন, তা সংক্ষেপে বিবৃত করা প্রয়োজন। ১৮২৬-এ ডিরো জিও হিন্দু কলেজের শিক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পড়াতে শু করেন। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-এ শিক্ষকতা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। ১৮৪৩-এর ১০ অক্টোবর "দি ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনের" প্রথম খণ্ডে

. দশম সংখ্যায় "হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে ডিরোজিওর শিক্ষকতা সম্বন্ধে প্রবন্ধকার লিখেছেনঃ "শিক্ষক হিসেবে তিনি বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের মনোজগতের দ্বন্দ্ব

ারগুলি খুলে দিতে সাহায্য করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে তিনি একটি বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যা আধুনিক যুগে এদেশে সর্বপ্রথম। বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড জঃ মিল বিদ্বৎজনের এক সভায় বলেন যে ডিরোজিও যে ভাবে ইমানুয়েল কান্টের জীবনদর্শনের সমালোচনা করেন, তাতে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন।"

১৮২৮-এ তাঁর উৎসাহী ছাত্রদের নিকট ডিরোজিও যে বিতর্ক বা আলোচনা সভা প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম ছিল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, এই সংস্থাটির চরিত্র নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ১৮৭৯-এ তাঁর "রিফ্লেকশনস্ অব আলেকজান্ডার ডাফ" গ্রন্থে লেখেন ঃ "এই সংগঠনের সভাগুলিতেই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, কলকাতার সেরা তণেরা তৎকালীন প্রথা-প্রধান সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রচলিত ধর্মীয় অন্ধসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিদ্ধে বিদ্রোহই ছিল তাঁদের আলোচনার মূল সুর।"

১৮২৯-এ ডিরোজিওর এই ছাত্রগোষ্ঠী পার্থেনন-এর সেই সংখ্যাটি দেখেন নি। কিন্তু অন্য একটি পত্রিকায় পার্থেনন-এ কি কি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। তার নামের তালিকা দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাতে লেখা প্রবন্ধের মধ্যে ছিল মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং এদেশে জুরি প্রথা প্রবর্তনের সপক্ষে মতামত। হিন্দু কলেজের রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষ ও বেশীর ভাগ অভিভাবক পার্থেনন পড়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হলে ছাপাখানা থেকে কর্তৃপক্ষ "পার্থেননের" দ্বিতীয় সংখ্যাটি তুলে নিয়ে বাজেয়াপ্ত ও "পার্থেননের" প্রকাশ নিষিদ্ধ করলেন। ডিরোজিওপন্থী ছাত্রদের এই পত্রিকাটির অপমৃত্যুতে একই সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করলেন হিন্দু রক্ষণশীলদের কাগজ সমাচার চন্দ্রিকা ও উগ্রতপা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী মুখপত্র জন বুল। ১৮৩০ এর ডিসেম্বরে জন বুল লিখল ঃ পার্থেনন কর্তৃক বিপজ্জনক মত প্রচার করা বন্ধ হয়েছে। এদেশীয় ছাত্রদের একচুল স্বাধীনতা দিলে তারা মাথায় চেপে বসতে চায়। তাদের এই এঁচোড়ে পাকা বাড়াবাড়ি বন্ধ করে তাদের অভিভাবকরা ভাল কাজই করেছেন।" এর ২ বছর পরে ১৮৩১-এ হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে শিক্ষকতার পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন। ১৮২৬-এ ডিরোজিও "To India – My Native Land" সনেটটি রচনা করেন। ভারতকে স্বদেশ বলে ভালবেসে কোনও ভারতীয় কবির কাব্যরচনা এই প্রথম। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেন। এই প্রজন্মের তণেরা কবিতাটির কথা হয়তো জানেন না ভেবে, সনেটটির দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত বঙ্গানুবাদ পুরো উদ্ধৃত করছি ঃ

"স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিল এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এইমাত্র পুরস্কার গনি,
তব শুভধ্যায় লোকে, অভাগা জননী!"

ডিরোজিও শুধু স্বদেশকেই ভালবাসেননি, ভালবেসেছিলেন সারা পৃথিবীর নির্যাতিত ও উৎপীড়িতদের। তাঁর রচিত কবিতার মধ্যে আছে "ফ্রিডম টু দি স্লেভ" বা ক্রীতদাসের মুক্তি বলে একটি কবিতা, তাতে ডিরোজিও লিখেছিলেন

"কে মন লেগেছিল তার মনে
প্রথম যখন শুনল নিজের কানে

দাসত্ব তার ঘুচে গেছে আজ থেকে!
স্পন্দিত হল হৃদয় তাহার
খুশিতে গর্বে মিশে —
আজ থেকে সে যে স্বাধীন মানুষ হ'ল।''

রামমোহন রায় ও তাঁদের সমর্থকদের সঙ্গে ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের অনেক প্রশ্নেই মিল ছিলনা। কারণ এক্কেরবাদী রামমোহন আর ডিরোজিও ও তার শিষ্যরা ছিলেন নাস্তিক। তা সত্ত্বেও রামমোহন ও তাঁর বন্ধুরা সতীদাহের বিদ্ধে যে আন্দোলন করেছিলেন, তাকে সমর্থন করেছিলেন ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল। যখন বড়লাট বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করলেন, তখন এই কাজকে অভিনন্দন জানিয়ে ডিরোজিও একটি কবিতা লেখেন ঃ

''শোন, শোন, শুনেছো কি তোমরা
থেমে গেছে সতীদের যন্ত্রণা-ক্রন্দন!''

তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে ডিরোজিও একটি কবিতা লেখেন, যেটি এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ডিরোজিও নামাঙ্কিত হলের মধ্যে লেখা আছে। ডিরোজিও লিখেছিলেনযে, ফুল ফোটার সময় পাপড়িগুলি খুলতে দেখে যেমন সুন্দর লাগে দেখতে তোমাদের মনের বন্ধদরজা খুলে যাচ্ছে। যখন দেখতে পাব যে তোমাদের খ্যাতি দর্পণে দেখতে পাচ্ছি, তখন আনন্দে বুঝব আমার জীবন বৃথা হয়নি। ডিরোজিওর ছাত্ররা তাঁর সম্বন্ধে কি লিখে রেখে গেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। রাধানাথ লিখেছেন ''তিনি বলতেন সর্বদা সত্যানুসন্ধান করো। পাপ ও অন্যায়ের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা। সত্যানুসন্ধানের চেষ্টায় ভারতের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হতে পারে না।'' রামগোপাল ঘোষ বলতেন ''যে তর্ক করে না, সে অন্ধ গোঁড়ামিতে ভুগছে। যে তর্ক করতে পারে না, সে নির্বোধ এবং যে তর্ক করতে ভয় পায় সে ক্রীতদাস।'' আর একজন ছাত্র হরমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেনঃ ''ডিরোজিওর ছাত্ররা সকলেই সত্যের উপাসক বলে বিবেচিত হতেন।''

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিত-এ লিখেছেন যে তাঁর বোম্বাই-এর বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে কাথিওয়াড়ে এক ডিরোজিওপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সবসময়ই তাঁর মহান শিক্ষকের গুণগান করতেন। একবার তিনি ''কাথিয়াওয়াড়ে কুশাসন'' শিরোনামায় সংবাদপত্রে কয়েকটি চিঠি লিখে দেশীয় রাজ্যে কুশাসনের কথা জনগণের কাছে প্রচার করেছিলেন। তিনি এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। কিন্তু এর বিদ্ধে এমন আন্দোলন শু হয়ে যায় যে ঐ সামন্ত রাজ্যের শাসক সন্ন্যাসীকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে শাসনকার্য পরিচালনার গুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করতে বাধ্য হ'ন। এই অজ্ঞাত ডিরোজিওপন্থী কে তা এখনও আমরা জানতে পারিনি।

ডিরোজিও শিক্ষকতার পদ থেকে অপসারিত হলেন। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল চেতনা কমার বদলে বাড়তে লাগল। ১৮৩১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল-এ হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র চিঠি লিখে ধারালো প্র করলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করার আগে এ দেশ বর্বরতার স্তরে ছিল, এ কথা মনে করার অধিকার কে দিয়েছে? ভারত ছিল একটি শিল্পসমৃদ্ধ, উন্নত সভ্য দেশ এবং আমেরিকার দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে তবেই ভারতবাসীর দুর্গতি মোচন সম্ভব হবে। এছাড়াও তখনকার দিনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত টুকরো খবর থেকে একথা আমরা জানতে পারি যে টম পেইনের রাইট্স্ অব ম্যান এবং জেরেমি বেন্থামের ইমানসিপেট দি কলোনিজ-এর মত বই কলকাতায় এলে, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তার কয়েক শত কপি কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে বিক্রি হয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত। ডিরোজিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত ক্যালেইডোস্কোপ পত্রিকাটির সঙ্গে। তাতে ১৮২৯-এর ২ সেপ্টেম্বর একটি প্রবন্ধে (সম্ভবত তাঁরই রচনা) লেখা হয় যে ''শুধু সামরিক শক্তির জোরেই ভারতকে পরাধীন করে রাখা সম্ভব হয়েছে। সৈন্যদের সরিয়ে নাও, অমনি দেখবে, শাসকদের প্রতি ভয়-ভক্তির বদলে তাদের মেরে তাড়াবার উদ্যোগই নিচ্ছে ভারতবাসী।''

১৮৩৫-এর ৫ জানুয়ারী কলকাতার টাউন হলে ইংরেজ শাসনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার দাবি করে একটি বড় সভা হয়। ডিরোজিও ছাত্র ও দ্বিভাষী জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক ঐ সভাকে এক দৃপ্ত ভাষণে বলেন ঃ ''গরীব ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ কেন কেড়ে নেওয়া হয়? তারা নিরন্ন ও অর্ধ উলঙ্গ থাকবে, আর বিদেশী শাসনের ও বিজাতীয় ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হবে কেন?'' (বেঙ্গল হরকরা ত্রোড়পত্র, ৬ জানুয়

ারী, ১৮৩৫)

ঐ বছরই, ১৮৩৫-এ হিন্দু কলেজের ১৬ বছরের ছাত্র কৈলাশচন্দ্র দত্ত একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "শতবর্ষ পরে তোমরা কল্পনার ভারতবর্ষ" এবং প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল "১৯৪৫-এ ৪৮ঘন্টার দিনলিপি"। প্রবন্ধটি ছেপে বেরিয়েছিল ১৮৩৫-এর ৬ জুন তারিখের ক্যালকাটা লিটারেরি গেজেট-এ। তাতে কৈলাশচন্দ্র লিখেছিলেন, ইংরেজ বড়লাট বুচারের অত্যাচারী শাসনে অসহ্য হয়ে ওঠায় স্বভাবশান্ত ভারতীয়রাও সশস্ত্র গণবিদ্রোহ করে বড়লাটকে গদিচ্যুত করে, দেশের সেরা দেশভক্তদের নিয়ে একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ পরাজিত হ'ল এবং বিদ্রোহের তণ বাঙালি নেতাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল। জল্লাদের হাতে মৃত্যুবরণের ঠিক আগে ঐ বিদ্রোহী নেতা চিৎকার করে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন যে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু নেই।

১৮৩৩-এর বার্ষিক সংখ্যা ক্যালকাটা ম্যাগাজিন থেকে জানা যাচ্ছে (পৃঃ ১৭৬) যে, ঐ বছরই কলকাতার একদল ছাত্র ব াংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতে একটি মাসিক পত্র বের করেন, তার নাম বিজ্ঞান সার-সংগ্রহ। তার প্রথম সংখ্যার মুখবন্ধে প্রকাশকরা লিখছেন যে, "ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে প্রচার করাই এ পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহার ফলে এদেশের তণরা সোৎসাহে দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য কাজে নামেন। আমাদের প্রধান লক্ষ্য পাঠকদের আনন্দ দেওয়া নহে। তাহাদের শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের মহত্তর কর্মযজ্ঞে উদ্দীপিত করাই এ পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

১৮৩৮-এর ২০ ফেব্রুয়ারী, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ৫ জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে, যৌথভাবে স্বাক্ষর করে এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। তাতে বলা ছিল যে দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়মিত আলোচনার জন্য তাঁরা একটি সংগঠন গড়তে চান ও সেই উদ্দেশ্যে ১৮৩৮ এর ২২ মার্চ সংস্কৃত কলেজে তাঁরা একটি সভা আহ্বান করছেন। সেই সভায় প্রায় ২০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, যাঁদের বেশির ভাগই ছাত্র। তাঁরা সর্বসম্মতভাবে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার নাম হয় "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" বা Society for the Acquisition of General Knowledge (SAGK) । ১৮৩৮, ১৮৪০ ও ১৮৪১-এ ঐ সংগঠনের বিভিন্ন আলোচনা সভায় পঠিত বাছাই করা প্রবন্ধের সংকলন ১৯৫৬-তে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সেইখান থেকেই উপরে বর্ণিত তথ্য সংগৃহীত। ১৮৩৮, ১৮৪০ ও ১৮৪১ তিন বছরের সংগঠনের সভ্যদের একটি তালিকাও সংগঠকরা ছেপে বের করেন। প্রায় ২০০ নামের মধ্যে পাওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লা হিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম। একটি প্রবন্ধে মাতৃভাষা বাংলায় সমস্ত শিক্ষাদানের ও সরকারি কাজকর্ম চ ালানোর প্রস্তাবনা করা হয়। ১৮৩৮-এ এরকম প্রবন্ধ রচনা সত্যই বিস্ময়কর।

১৮৪১-এ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠির অনেকে আর এক কদম এগিয়ে কলকাতায় গঠন করলেন একটি আধ রাজনৈতিক সংগঠন 'দেশহিতৈষী সভা'। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও টাউন স্কুলের শিক্ষক সারদাপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন এই উদ্যমের প্রধান পুষ। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা-সভায় তাঁর ভাষণে সারদাপ্রসাদ বলেন ঃ" ইংরেজ রাজত্বের গোড়া থেকেই আমাদের শাসক শ্রে ণীর মতলব ছিল আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। আর স্বাধীনতাহীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ। তাই আমার প্রস্তাব এই যে দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের প্রথমত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, দ্বিতীয়ত দেশকে ভ ালবাসতে হবে। দেশপ্রেমই হবে ঐক্যের ভিত্তি এবং সেই ঐক্য পরিচালনা করতে হবে জাতীয় কল্যাণের পথে।" এই সংগঠনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের জন্যই। (ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, নভে ম্বর ১৮৪১)

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংলন্ডে গেলেন, তখন তাঁর মারফৎ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠি কলকাতায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন ক্রীতদাসত্ব-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ইংরেজ নেতা জর্জ টমসনকে। তিনি কলকাতায় এসে ১৮৪২-৪৩ এ সাধারণ স্থ ানোপার্জিকা সভার অনেকগুলি অধিবেশনে বক্তৃতার বিবরণী ইয়ংবেঙ্গলের দ্বিভাষিক মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটার-এ ছেপে বের করা হয়। (বেঙ্গল স্পেক্টেটার, ১,৮, ১৫ ও ২৪ মার্চ, ১৮৪৩)

১৮৪৩-ওর ১৩ এপ্রিল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠির শতাধিক প্রতিনিধির সভাতে ও জর্জ টমসনের উপস্থিতিতে ভারতের জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও তাদের অভাব-অভিযোগ সরকারের কাছে পেশ করাবার উদ্দেশ্যে এক নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হ'ল। তার নাম হ'ল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। এতেই মিশে গেল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। নতুন সংগঠনের সভাপতি হলেন জর্জ টমসন, সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কোষাধ্যক্ষ রামগোপাল ঘোষ। ভারতীয়দের বিদ্ধে রামগোপাল ঘোষ বহু জায়গায় উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করেন। তাঁকে তাই তখন বলা হ'ত "Black Demosthenes"। ভারতীয় প্রজার উপর এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে অত্যাচার করতে দেখে, রাধানাথ শিকদার তাকে বেদম প্রহার করেন। এর জন্য মামলায় তাঁর একশত টাকা জরিমানা হয়, কিন্তু রাধানাথ কোনও অন্যায় করেছেন বলে আদালতে স্বীকৃতি দেন নি। এই ঘটনা ও মামলার পূর্ণ বিবরণ বেঙ্গল স্পেক্টেটার-এ ছাপা হয় ও রাধানাথকে তখনকার ছাত্ররা খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এছাড়াও বেঙ্গল স্পেক্টেটর-এর পাতায় একটি প্রশ্নমালা ছাপা হয় যাতে চাষের ও চাষীদের দুর্গতির কারণ তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা ছিল। (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১৭ই মে ১৮৪৩)।

ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলের ভূমিকাকে এই শতাব্দীর প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে ফিরে দেখে কি সামগ্রিক মূল্যায়ণ করব? প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসু (এবছর যাঁর জন্মের শতবর্ষ) ইয়ংবেঙ্গলদের সম্বন্ধে প্রশংসা করে লিখেছিলেন ঃ "ইয়ংবেঙ্গলের দুই উপাস্য দেবতা ছিলেন স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদ। অন্ধ ভক্তি নয়, বুদ্ধির মুক্তিই লক্ষ্য হতে হবে — ডিরোজিও শিষ্যদের এই কথাই শিখিয়েছিলেন।" (নির্মলকুমার বসু ঃ মডার্ণ বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৫৯)। অধ্যাপক সুশোভন সরকার অবশ্য ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গলের প্রগতিবাদী ভূমিকার প্রশংসা করেও একটি সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, "প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের গরিমা নিয়ে আচ্ছন্ন থাকায় দেশের মুসলিম সমাজের সঙ্গে তাঁদের একটা দুরত্ব থেকে গিয়েছিল। নবজাগরণের এই দুর্বলতাটির ফলে উত্তরকালে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে।" (সুশোভন রেনেসাঁস অ্যান্ড আদার এসেজ, ১৯৭০)। মনে হয় তাঁর এই মূল্যায়ণটিই সঠিক, যদিও তাতে করে সামগ্রিকভাবে ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা কমে যাবার কারণ নেই।

ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গলকে নতুন শতাব্দীর প্রথম বছরে ফিরে দেখতে গিয়ে মনে সর্বশেষ যে প্রশ্ন ওঠে তা এই — এখন আর ডিরোজিও এবং ইয়ংবেঙ্গলকে নিয়ে আলোচনা করার কিছু মূল্য আছে কি? আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি নিশ্চয় আছে। শতাব্দীর শেষেও দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর যখন ধর্মান্ধতা ও নানান ধরণের অন্ধ বিশ্বাসের প্রবল আক্রমণ দেখা যাচ্ছে, নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনাকে যখন সেই সব অশুভ শক্তি আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করছে, তখন তাদের অবশ্য মনে করিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট মূল্য আছে যে আজ প্রায় ১৬০/১৭০ বছর আগে, সেই প্রজন্মের একজন তণ শিক্ষক ও তাঁর তণতর ছাত্ররা ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও অমানবিকতার অন্ধকার রাত্রে বুদ্ধির মুক্তির, যুক্তিবাদের, জ্ঞানের ও মানবিকতার মশাল হাতে সাহসের সঙ্গে এগিয়েছিলেন — সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের গঞ্জনা, বিদ্রূপ ও আক্রমণের তোয়াক্কা না করে। তাঁদের সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইয়ংবেঙ্গলের এ ভূমিকা তো ভোলা উচিত নয়।

যখন শীতকালীন লোকসভা অধিবেশনেও মেয়েদের আসন সংক্রান্ত বিলটি আলোচনার জন্য আসবে কিনা সন্দেহ, যখন আজও পণের দাবীতে বধূহত্যা বন্ধ হয়নি, তখন মনে পড়ে যায় যে ১৮৩১-এ ডিরোজিওপন্থী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের অধিকারের সপক্ষে একটি ইংরেজি নাটিকা লিখেছিলেন — বড়ন্দ্ব ত্নন্দ্বজব্দন্দ্বন্তুত্তব্ধন্দ্বস্তুব্দ। আর ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম নেতা রামগোপাল ঘোষের জীবনের মূল মন্ত্রই ছিল "যে তর্ক করতে পারেনা সে নির্বোধ, আর যে ভয়ে তর্ক করেনা সে ক্রীতদাস।" তাই একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে আমরাও "ইয়ংবেঙ্গল"-কে অভিনন্দন জানিয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতই বলছি ঃ প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিদ্ধে লড়াই করলে বিপদের সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই। নির্ভীকভাবে সে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের বহু তণ, সমাজচ্যুত হওয়ার চরম দণ্ড মাথা পেতে নিতেন। তাই তাঁদের কথা নতুন করে মনে রেখে এ যুগের তণদের বলতে হবে ঃ আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com